International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 125-133
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.204

ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যে দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটকী সঙ্গীত: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সুপর্ণা পতি
শিক্ষিকা, ভট্টের কলেজ দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 12.03.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ancient Indian music was once a singular and unified tradition, with a common system prevalent throughout India. Over time, influenced by the social, cultural, political, and religious shifts within the nation, the existing musical traditions were somewhat sidelined and became impacted by external elements. However, during the Muslim era, Indian music became bifurcated. Due to the dominance of Muslim rule in North-Eastern India, Muslim culture integrated with Indian music, creating a new trend. On the other hand, as Muslim rule was not permanently established in South India, the musical tradition there remained largely unchanged. This historical divergence eventually led to the two prominent systems we see today: the 'North-Indian system' or 'Hindustani system' and the 'South-Indian system' or 'Carnatic system'. By the middle of the Muslim era, the North-Indian musical system fully embraced the aristocratic identity of Hindustani and gradually diverged from the Carnatic musical tradition. While Indian Hindustani music evolved under the influence of Persian music, Carnatic music remained enriched with its original elements and maintained an independent nature. Just as Hindustani music lost much of its original characteristics due to the influence of foreign music and culture, the Carnatic music prevalent in South India has largely preserved the heritage of ancient India to the present. Indian music has a long and profound history. To understand the history of any subject, it is essential to have deep knowledge not only of the subject itself but also of various related factors. This is equally crucial for music. Currently, the resources for the history of music include various ancient musical treatises and historical accounts written by foreign historians regarding the rise and fall of kings and emperors. Based on these sources, an analysis of Carnatic music has been presented as far as possible.

Keywords: North Indian music, South Indian music, system, culture, Carnatic music.

ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীত ছিল একক এবং অভিন্ন। সমগ্র ভারতে সঙ্গীতের একটিমাত্র পদ্ধতির প্রচলন ছিল। কিন্তু মুসলমান যুগে ভারতীয় সঙ্গীত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। উত্তর-পূর্ব ভারতে মুসলমান রাজত্বের আধিপত্যের কারণে মুসলিম সংস্কৃতি ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়ে এক নবধারার সৃষ্টি করে। অপরদিকে, দক্ষিণ ভারতে মুসলিম রাজত্ব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে এখানকার সঙ্গীত ধারা অনেকাংশে অপরিবর্তিত। ভারতীয় সঙ্গীতে দুই পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে- একটি উত্তর ভারতীয় পদ্ধতি বা হিন্দুস্থানী পদ্ধতি, অন্যটি দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতি বা কর্ণাটকী পদ্ধতি।

উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রচলিত সঙ্গীত হল- 'উত্তর-ভারতীয় পদ্ধতি' বা 'হিন্দুস্থানী পদ্ধতি' যা সারা উত্তর ভারতে- মানে বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, বোম্বাই, দিল্লি প্রভৃতি স্থানে চর্চা হয় এবং বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে অর্থাৎ মাদ্রাজ, মহীশূর, অন্ধ্র, কেরালা ইত্যাদি স্থানে প্রচলিত সঙ্গীত 'দক্ষিণ

ভারতীয় পদ্ধতি' বা 'কর্ণাটকী পদ্ধতি'। এখন যেভাবে আমরা হিন্দুস্থানী এবং দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতিকে চিহ্নিত করছি, চতুর্দশ শতাব্দীর আগে কিন্তু এভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।

ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়- খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দী। এই সময়ের মধ্যে সমগ্র ভারতীয় সঙ্গীতে শুদ্ধি যজ্ঞের সূচনা হয়। শুদ্ধি যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় আর্য ও অনার্য অধিবাসীদের দেশীয় ও জাতীয় গানের সুরগুলি পরিশুদ্ধ করে অভিজাত রাগ গোষ্ঠীভুক্ত করা। এই সময়ের মধ্যে রাগ নাম কল্পনা, রাগরূপ, রাগ বিকাশের মধ্যে দিয়ে রাগের আভিজাত্য সৃষ্টি হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দেশীয় ও জাতীয় সুরগুলি এই সময় সংস্কৃত হয়ে অভিজাত রাগ তালিকাভুক্ত হল কিন্তু এই তালিকায় উত্তর বা দক্ষিণ এই ধরনের কোন উল্লেখ বা চিহ্ন রইল না, বরং অখন্ড ভারতের রাগ বলে সবগুলিই গণ্য হতে লাগল। মোটামুটিভাবে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতের বিকাশ প্রায় একই ধরনের ছিল। এই সময় আমরা পাই সঙ্গীতশাস্ত্রী শার্ঙ্গদেবকে। দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত গুনী শার্ঙ্গদেব ভারতীয় সঙ্গীতের বিক্ষিপ্ত উপপত্তিক ধারাকে সর্বপ্রথম 'সঙ্গীত রত্নাক' নামক গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি দেবগিরি রাজ্যের যাদব বংশীয় রাজসভার প্রধান সঙ্গীতাচার্য ছিলেন। এই সময় মারাঠা সাম্রাজ্য দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই জন্য অনুমান করা যায়- শার্ঙ্গদেব দক্ষিণ ও উত্তর ভারত দুই অঞ্চলেরই সঙ্গীত ধারার সংস্পর্শে আসেন। অনুমান করা হয়, ১২০৫ থেকে ১২৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শার্ঙ্গদেব *সঙ্গীত রত্নাকর* রচনা করেন। বহু জ্ঞানী পন্ডিতদের বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থের সাঙ্গীতিক অধ্যায়গুলিতে তিনি প্রাচীন এবং সমসাময়িক কালের সঙ্গীতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটিতে তিনি দুটি ধারার বা পদ্ধতির কোনও পার্থক্য নির্দেশ করেননি। আনুমানিকভাবে উত্তর ভারতীয় (হিন্দুস্থানী) এবং দক্ষিণ ভারতীয় (কর্ণাটকী)- এই দুই নামে ভারতীয় সঙ্গীত পৃথকভাবে চিহ্নিত হয় শার্ঙ্গদেবের প্রায় ১০০ বছর পরে।

ভারতবর্ষে মোটামুটিভাবে ইসলামিক যুগের সূচনা হয় ১১৭৪ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর রাজত্বকাল থেকে। এর পূর্বে সমগ্র ভারতে খাঁটি ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। মহম্মদ ঘোরীর আমলে ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতির মধ্যে সেভাবে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। তবে আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকালে (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি:) উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে অনেকখানি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময় প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের সূত্রগুলি ক্রমশ: দুর্বোধ্য এবং লোপ পেতে থাকে। নানান রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও সঙ্গীতের উজ্জ্বল বিকাশ ঘটে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকালে। তাঁর সময় সর্বপ্রথম হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সূত্রপাত হয়েছিল বলে অনেক পন্ডিত মনে করেন। চালুক্যরাজ হরিপালের 'সঙ্গীত সুধাকর' গ্রন্থে উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত- এই দুটি নামের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় খিলজীর আমলেই। ১৩০৯ থেকে ১৩১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গ্রন্থটি রচিত। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির গভীর অনুরাগী ও পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আলাউদ্দিন খিলজী। তাঁর দরবারে বহু গুনী সঙ্গীতজ্ঞ সসম্মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সঙ্গীতবিদ্ আবুল হাসান বা আমীর খসরু ছিলেন অন্যতম। কথিত আছে আমীর খসরুর জন্য খোরাসান থেকে তাঁর পিতা এসেছিলেন ভারতের মাটিতে। এই প্রতিভাবান ব্যক্তিটি ছিলেন যেমন বুদ্ধিমান তেমনি সুচতুর। তিনি একজন উচ্চ শ্রেণির গায়ক এবং রচনাতেও ছিলেন যথেষ্ট দক্ষ। তিনি প্রথম ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পারস্য দেশের সঙ্গীতের মিশ্রণ ঘটান। যার ফলে ভারতীয় সঙ্গীতে নতুন রীতির, নতুন নতুন রাগ-রাগিনীর আমদানি হয়।

সঙ্গীতে আমীর খসরুর দান এক কথায় অপরিসীম। ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পারসিক সঙ্গীতের মিশ্রণে নতুন নতুন রাগ, তাল, গায়নশৈলী ও বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন করেন। তিনি পারস্য সঙ্গীতের অনুকরণে ভারতীয়

সঙ্গীতে ঠাটের পরিবর্তে বারোটি 'মোকাম' এর প্রবর্তন করেন। বিভিন্ন হিন্দু রাগ-রাগিনীর সঙ্গে পারসিক রাগ-রাগিনীর মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি- ইমন, সাজগিরী, সরপর্দা, জীলফ, বাখরজ প্রভৃতি রাগের সৃষ্টি করেন। রাগ মিশ্রণের ক্ষেত্রে আমীর খসরুকে পথপ্রদর্শক বলা যায়। পরবর্তীকালে তাঁর পথ ধরেই হিন্দু রাগ-রাগিনীর সংমিশ্রণে বহু নতুন রাগ সৃষ্টি হয়।

চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। মুসলিম শাসকদের মধ্যে অনেকেই সঙ্গীতের উন্নতি ও প্রসারে সাহায্য করেন। এনারা অধিকাংশই রাজসভায় সঙ্গীতজ্ঞদের স্থান দিয়েছিলেন। এই সময় ভারতীয় সঙ্গীতে পারসীয় সঙ্গীতের অনুপ্রবেশ বা মিশ্রনের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুটি ধারা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির দিক থেকে বিশেষভাবে দুজন মুসলিম শাসকের রাজত্বকাল স্মরণীয়। এনারা হলেন- আলাউদ্দিন খিলজী, (১২৯৬-১৩১৬) এবং সম্রাট আকবর (১৫৬৫-১৬০৫)। আলাউদ্দিন খিলজীর সময় ভারতীয় এবং পারসিক সঙ্গীত মিশ্রণে উদ্ভব হয় কাওয়ালী পদ্ধতি, এই গীত রীতি আমীর খসরুই প্রথম প্রচলন করেন। সঙ্গীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- মুসলিম আমলে সঙ্গীতের উৎকর্ষতা অব্যাহত ছিল এবং আকবরের আমলে তার চরম বিকাশ ঘটেছিল।

প্রবীণ ভারতীয় সঙ্গীতে নবীনতার ছাপ লেগেছিল মূলত: এই মুঘল আমলেই। নতুন রঙে রঙিন হয়ে উঠেছিল ভারতীয় সঙ্গীত এই সময়। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে পারসীয় প্রভাবে ভারতীয় রাগ-রাগিনী বেশ পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে যদিও সঙ্গীতের প্রচলিত গায়ন-রীতি উপেক্ষা হচ্ছিল কিন্তু মোটের উপর এই নতুন পদ্ধতি প্রিয় হয়ে ওঠে এবং উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়। এই মিলন মিশ্রণ এবং নতুন সৃষ্টিতে ভারতীয় সঙ্গীতের ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়ে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করে। উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয়-এই দুটি পৃথক ধারার সূত্রপাত হয় খ্রিস্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে। আলাউদ্দিন খিলজীর সময় থেকে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে মিশ্রণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, মুঘল আমলে তা ব্যাপক হয়। অর্থাৎ, মুসলিম যুগের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতি পুরোপুরি হিন্দুস্থানী নামের আভিজাত্য গ্রহণ করে কর্ণাটকী সঙ্গীত ধারার সঙ্গে ধীরে ধীরে আলাদা বা পৃথক হয়ে পড়ে। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ থেকে অষ্টদশ শতকের ভারতীয় সমাজে এই পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট হয়। এরপর থেকেই দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত তার নিজস্ব ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য নিয়ে বেড়ে ওঠে। অনেকের ধারণা উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যেমন বৈদেশিক সঙ্গীত ও সংস্কৃতির প্রভাবে কালক্রমে তার নিজের বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে হারিয়ে ফেলেছে, সেদিক থেকে দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত কর্ণাটকী সঙ্গীত সেভাবে প্রভাবিত হয়নি এবং আজও অনেকাংশেই প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য বজায় রেখে আসছে নির্ভেজাল রূপে।

বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে মাদ্রাজ, মহীশূর, অন্ধ্র, কেরালা প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত সঙ্গীত হল 'দক্ষিণ ভারতীয়' বা 'কর্ণাটকী সঙ্গীত'। প্রভূত ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এই সঙ্গীতের একটি বৈচিত্রপূর্ণ দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ধর্মীয় সঙ্গীত, কলা সঙ্গীত, নৃত্য-গীত, গীতি নাট্য, লোকসঙ্গীত-সবদিক থেকেই দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত সমৃদ্ধ। দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন তামিল নাটকে সঙ্গীতের বিভিন্ন উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রখ্যাত তামিল নাটক 'শিলপ্পাদিকরম্'- এর 'অরঙ্গেরুকদাই'[১] নামক তৃতীয় অধ্যায়ে দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীতের উল্লেখ আছে। তামিল নাটকে ষড়জাদি সাতটি লৌকিক স্বরের নাম উল্লেখ আছে, সেগুলি হল-কুরাল, তুত্তাম্, কৈক্কিলাই, উলাই, ইলাই, বিলারি ও তারম্। স্বরগুলি নামে পৃথক হলেও প্রয়োগ বিধি পৃথক ছিল না। খ্রিস্টীয় সপ্তম

১. প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *রাগ ও রূপ (দ্বিতীয় ভাগ)* , শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, জুলাই ১৯৯৯, কলিকাতা। পৃষ্ঠা - ২৬

শতকে পল্লবরাজ মহেন্দ্র বর্মনের সময়ে পাদুকোট্টা রাজ্যে সাতটি গ্রাম-রাগের স্বরলিপির পরিচয় পাওয়া যায়, ইতিহাসের পাতায় এটি একটি স্মরণীয় ও মূল্যবান নিদর্শন। শিখানাথ স্বামীর গুহা মন্দির যা কুডুমিয়ামলই নামক স্থানে অবস্থিত, এই মন্দিরের পেছনে বিরাট একটি ঢালু শিলাখণ্ডের গায়ে সাতটি গ্রাম-রাগের স্বরলিপি খোদাই করা আছে। এই শিলালিপিটি রাজা মহেন্দ্র বর্মনের কীর্তি হিসেবে মনে করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের নারদ মুনি রচিত 'শিক্ষা' গ্রন্থেও এই সাতটি গ্রাম রাগের সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায়। "১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে এই শিলালিপি আবিষ্কৃত হলেও ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দেই ডা: পি. আর. ভান্ডারকার রাও সাহেব এইচ. কৃষ্ণ শাস্ত্রীর সাহায্যে স্বর লেখার ভাষ্য সমেত সাধারনে তা প্রকাশ পায়। পাদুকোট্টাই - দরবারের কর্তৃপক্ষ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ভিন্নভাবে তার একটি তথ্য প্রকাশ করেন।"[২] এছাড়াও এই গ্রাম-রাগের বিবরণ প্রকাশিত হয়-এপিগ্রাফিকা-ইন্ডিকা ও মাদ্রাজ-এপিগ্রাফিক্যাল রিপোর্টেও। নারদীয় *শিক্ষা* গ্রন্থ এবং এই প্রাপ্ত শিলালিপির গ্রাম-রাগ সম্বন্ধীয় আলোচনা থেকে এককথায় উপনীত হওয়া যায় যে- সাতটি শুদ্ধ গ্রাম-রাগের প্রচলন সর্বত্র ছিল। কুডুমিয়ামলই- প্রস্তরলিপির মতোই পাদুকোট্টাইয়ের কাছে তিরুময়মেও অনুরূপ একটি প্রস্তর- স্বরলিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় হল- কালের কবলে সেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

চালুক্য রাজাদের (চোল রাজ- রাজারাজ ও রাজেন্দ্র) আমলে শৈব নায়ানমারদের তামিলীও 'দেবর' থেকে জানা যায় যে, সেই সময়ে শিবস্তোত্রগুলি বিভিন্ন রাগে গাওয়া হত। শার্ঙ্গদেবকৃত *সঙ্গীত রত্নাকর* (খ্রিস্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক) গ্রন্থে উল্লেখিত কপাল, কম্বল ইত্যাদি প্রবন্ধ শৈব-গীত গুলি খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে অষ্টম শতকে বা তার পূর্বে সমাজে প্রচলিত শিব মহিমা সূচক-গীতিধারা থেকে জন্মলাভ করেছিল বলে অনুমান করা হয়।

রাজা বীর রাজেন্দ্রর সময় অহমার্গ-সঙ্গীত নামে একপ্রকার সঙ্গীতের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই অহমার্গ সঙ্গীত অনেকটা বৈদিকোত্তর ক্লাসিক্যাল পদ্ধতির অনুরূপ ছিল মনে করা হয়। চোলরাজ সোমেশ্বর রচিত 'অভিলাষার্থচিন্তামণি' বা 'মানসোল্লাস' (১১৩১ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থটি সংস্কৃত সাহিত্য জগতে একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। এই গ্রন্থে আলোচিত গীতবিনোদ (গীতাধ্যায়) ও বাদ্যাবিনোদ (বাদ্যাধ্যায়) জৈন সঙ্গীতশাস্ত্রী পার্শ্বদেবের 'সঙ্গীত সময় সার'' (খ্রিস্টীয় নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে লেখা) এবং শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে আলোচিত গীত ও বাদ্য অধ্যায়েরই অনুরূপ। সুতরাং দেখা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে গীতি, রাগ ও বাদ্যের - রূপ, গতি ও বিকাশের ধরন প্রায় একই ছিল। জগদেকমল্ল প্রতাপ চক্রবর্তী রচিত 'সঙ্গীতচূড়ামণি' গ্রন্থ দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট অবদান বলে সর্বজন স্বীকৃত। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বিকানীর রাজ গ্রন্থশালায় রক্ষিত আছে। যাদব রাজাদের আমলে দেবগিরির রাজা সিংহনের রাজত্বকালে *সঙ্গীত রত্নাকর* রচিত হয় শার্ঙ্গদেব কৃত। শার্ঙ্গদেবের পূর্ব পুরুষেরা কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন, মুসলিম অত্যাচারের ভয়ে পরে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে বসবাস করেন। *সঙ্গীত রত্নাকর* দক্ষিণ ভারতে রচিত হলেও গ্রন্থটি সমগ্র ভারতের প্রামানিক গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।

দক্ষিণ ভারতে সঙ্গীত সাধনার আরেকটি বিশেষ সময়কাল হল- কাকতীয় যুগ। এই যুগে একটি মন্দিরে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অনুশীলন হত। মৈলম্বের পানুগল-লেখমালায় এর উল্লেখ আছে। ধর্মবর্মের রাজা গণপতির সময়ে নৃত্য-গীতের উদ্দেশ্যে অমাত্য মল্ল একটি মন্দির উৎসর্গ করেছিলেন। সেই মন্দিরে- মৃদঙ্গবাদক, রন্ধ্রপূরক বা বংশীবাদক ও জলজ করণ্ডুবাদক প্রভৃতি শিল্পীরা নিযুক্ত ছিলেন। রাজা গণপতির

২. তদেব।

পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর হস্তিযুথনায়ক জয়সেনাপতি 'নৃত্যরত্নবলী' (১২৫৩-৫৪ খ্রি:) গ্রন্থ রচনা করেন। তাঞ্জোরের গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের পান্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। ড. রাঘবনের মতে, ১৪৩৩-১৪৬৮ খ্রিস্টাব্দে মেবারের রাজা রানাকুম্ভ তাঁর 'সঙ্গীত মীমাংসা' গ্রন্থে নৃত্যাবলী গ্রন্থ থেকে বহু উপাদান গ্রহণ করেছেন। কাকতীয় যুগের প্রচলিত কর্ণাটকী সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বহু নিদর্শন আজও পাওয়া যায়- রামাপ্পা মন্দিরের ভাস্কর্যে ও অন্যান্য স্মারক স্তম্ভে।

ভারতের ইতিহাসে দক্ষিণ ভারতের বিজয় নগর রাজ্যের একটা গৌরবময় ভূমিকা আছে। বিজয়নগরের উৎপত্তির ইতিহাস আজও নির্দিষ্ট করে নির্নীত হয়নি। বিভিন্ন পরিব্রাজক, পর্যটকদের বিবরণ থেকে বিজয়নগরের গৌরবময় ঐতিহ্যের বিবরণ আমরা পাই। একসময় বিজয়নগর ভারতীয় শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য ও সঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। আনুমানিক ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগরের পত্তন হয়। বিজয়নগরের রাজা হরিহর ও বুক্ক দক্ষিণ ভারতের সাহিত্য ছাড়াও স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি শিল্পবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। ড: রাঘবন তাঁর Music in the Dekkan and South India- প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : "Not only literature,- religious, secular and technical - was actually fostered, but the arts of architecture, sculpture, painting, music and dance received great impetus from the King and Courtier "[৩]. এই বিজয়নগর সাম্রাজ্যের মাধব-বিদ্যারণ্যের দান সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে আদৃত। বিদ্যারণ্য বা মাধব-বিদ্যারণ্যের অভ্যুদয়কাল ১৩২০-১৩৮০ খ্রিস্টাব্দ। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতিজ্ঞ, দার্শনিক ও সঙ্গীতশাস্ত্রী। 'সঙ্গীতসার' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি মাধব-বিদ্যারণ্য দ্বারা রচিত। বিদ্যারত্নই প্রথম ১৫ টি মেল বা জনকরাগ এবং ৫০ টি জন্য রাগের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি হলেন মেলচক্র বা জন্য-জনক বর্গীকরণের প্রথম প্রবর্তক। গোবিন্দ দীক্ষিত বিদ্যারণ্যকে কর্ণাটক- 'সিংহাসন ভাগ্য' বলে উল্লেখ করেছেন। গোবিন্দ দীক্ষিতকে নিয়ে মতদ্বৈততা আছে। অনেকে মনে করেন- গোবিন্দ দীক্ষিত নামে 'সঙ্গীত সুধা' গ্রন্থ যিনি রচনা করেন তিনি আসলে তাঞ্জোরের রাজ রঘুনাথ নায়ক। আবার এমনও জানা যায় যে- কর্ণাটকী সঙ্গীতের কৃতি পুরুষ বেঙ্কটমুখীর পিতা হলেন গোবিন্দ দীক্ষিত। যিনি রাজা রঘুনাথের প্রেরণাতেই দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটকী সঙ্গীত ধারা নব চেতনায় সৃষ্টি করেন। দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রী সিংহভূপাল বা *সঙ্গীত রত্নাকর* গ্রন্থের টীককার। তাঁর টীকা *সঙ্গীত সুধাকর*- এর মতো 'রসার্ণবসুধাকর'- নাট্যগ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীতাচার্য দত্তিলের 'দত্তিলম্' ছাড়া 'প্রয়োগস্তবক' এবং পার্শ্বদেবের 'সঙ্গীত সময়সার'- গ্রন্থ দুটি থেকে বহু উদ্ধৃতি সিংহ ভূপালের *সঙ্গীত সুধাকর* টীকায় পাওয়া যায়। রেড্ডিরাজ বেম-ভূপাল তথা বীরনারায়ণ খ্রিস্টীয় চতুর্দশ অব্দের শেষভাগে 'সঙ্গীত চিন্তামণি' গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি দক্ষিণ ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য সাঙ্গীতিক অবদান বলে স্বীকৃত। 'সাহিত্য চিন্তামণি' নামে একটি অলংকার গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। এছাড়াও আমরা পেয়েছি কল্লিনাথকে। যিনি বিজয়নগরের রাজা দেবরাজের পুত্র ইম্মাদিদেব তথা মল্লার্জন রায়ের অনুপ্রেরণায় সঙ্গীত রত্নাকরের 'কলানিধি' টীকা রচনা করেন। পঞ্চদশ শতকে ব্যাসরাজ, বাদিরাজ প্রমুখ সঙ্গীতশাস্ত্রীরাও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের বৈচিত্র্যপূর্ণ দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। কলা-সঙ্গীত, ধর্মীয় সঙ্গীত, নৃত্য-গীত, গীতি-নাট্য, লোকসঙ্গীত সবদিক থেকে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত সমৃদ্ধ। প্রাচীন ভারতের সমর-সঙ্গীত লুপ্ত হয়ে গেলেও, আধুনিককালে তার অভাব পূরণ করেছে গমনগীত (Marching song)। দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের

৩. প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *রাগ ও রূপ (দ্বিতীয় ভাগ)* , শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, জুলাই ১৯৯৯, কলিকাতা। পৃষ্ঠা - ২৯

বিভিন্ন প্রকার পরিলক্ষিত হয়। প্রভূত ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এই কর্ণাটকী সঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গীত শৈলীর আলোচনা করা যাক–

কীর্তনম্:- ধর্মীয় ও ভক্তি রসাত্মক সাহিত্য দ্বারা রচিত গীতবন্ধকে কীর্তনম্ বলে। হিন্দুস্তানী পদ্ধতিতে যেমন বিভিন্ন সাধুসন্ত দ্বারা লিখিত ভজন গাওয়ার প্রচলন আছে তেমনি কর্ণাটকী পদ্ধতিতেও সাধক দ্বারা লিখিত কীর্তনম্ক- এর প্রচলন আছে। পুরন্দর দাস, ত্যাগরাজ প্রমুখ হলেন কীর্তনম্ রচয়িতা। এই সঙ্গীত ধ্রুপদ শ্রেণির পবিত্র সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃত। এই গীতবন্ধ পঞ্চদশ শতকে প্রাচীন কর্ণাটকী ভজন বিবর্তিত হয়ে *'কীর্তনম্'* নামক কৃতির উদ্ভব হয়। তবে আধুনিক কীর্তনম্-এর জন্ম ঊনবিংশ শতকে। কীর্তনমে ঈশ্বর স্তুতি, পৌরাণিক কাহিনী, উপদেশাত্মক বাক্য প্রভৃতি ভক্তি-রসাশ্রিত সাহিত্যই প্রধান উপজীব্য বিষয়। সুর শুধু কাব্যের ভাব পরিস্ফুটনের সহায়ক মাত্র। কীর্তনম্-এ পদের শেষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রচয়িতার নাম থাকে এবং রচয়িতাগণ অনেক সময় 'মুদ্রা' বা ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। প্রাচীন কীর্তনমে পল্লবী, অনুপল্লবী ও চরনম্- এই তিনটি তুক্ থাকত। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই অনুপল্লবীর অনুপস্থিতি লক্ষিত হয়। সংস্কৃত ভাষা ছাড়াও দক্ষিণ ভারতীয় নানান ভাষায় কীর্তনম্ রচিত হয়। পঞ্চরত্ন, দিব্যনাম, উৎসব সম্প্রদায়, মনসা পূজা প্রভৃতি নামের কীর্তনম্ রচয়িতাদের মধ্যে - পুরন্দর দাস, ত্যাগরাজ, মুথুস্বামী দীক্ষিতর, শ্যামা শাস্ত্রী, স্বাতী তিরুনল, তালপক্কম্ চিন্নায়ার প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃতি:- দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কৃতির উদ্ভব কীর্তনম্ থেকেই। কীর্তনম্-এরই এক উন্নত রূপ কৃতি। কীর্তনম্-এ কথা বা সাহিত্যই প্রধান এবং সুর কথার বাহন মাত্র। অন্যদিকে কৃতির ক্ষেত্রে এর বিপরীত, অর্থাৎ কৃতিতে সুরই প্রধান। কৃতিতে তিনটি তুক্ থাকে- পল্লবী, অনুপল্লবী ও চরনম্। তালাপক্কম্ গীতিকারেরা প্রথম 'কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃতির উদ্ভব পুরন্দর দাসের পদ থেকে। বর্তমানে কৃতি কর্ণাটকী সঙ্গীতের সাহিত্য ও রাগ-ভেদের মূল বিকাশ রূপে স্থান লাভ করেছে।

কৃতি গায়ন পদ্ধতি:- প্রথমে মূল গায়ক বা বাদ্যযন্ত্রী বর্ণম্ দিয়ে শুরু করেন। তারপর তিনি মধ্যলয়ে রাগের বৈচিত্রময়তায় কিছু কৃতি পরিবেশন করেন। এইভাবে সঙ্গীতের একটি যথার্থ পরিমণ্ডল গড়ে তোলা হয় এবং এই পদ্ধতিকে 'মেলম্' বলে। এরপর 'রাগ আলপনা' দিয়ে শিল্পী কৃতির বিলম্ব কাল-এ প্রবেশ করেন এবং কতকগুলি সুনির্বাচিত আবর্ত দিয়ে সাহিত্য-এর 'নেরাভল' পরিবেশন করেন। রাগ ও লয়ের উপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে তিনি কল্পনাস্বরে সঙ্গীতের উপহার টেনে আনেন। এইভাবে ঐকতান সঙ্গীত সর্বোচ্চ স্তর পল্লবীতে পৌঁছায়। এই পল্লবী আবর্তের সহায়তায় সঙ্গীতের দক্ষতা ফুটিয়ে তোলা হয়। পল্লবীর পর পদম্, জাবলী, তিল্লানা প্রভৃতি সহজ ও চিত্তবিনোদনের সুর পরিবেশন করে পরিশেষে মঙ্গলম্ বা স্বস্তিবাচনের মাধ্যমে সঙ্গীতানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়। কৃতি রচয়িতাদের মধ্যে - পুরন্দর দাস, ত্যাগরাজ, শ্যাম শাস্ত্রী প্রমুখও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পদম্:- সরল রাগ ও তালে গেয় বিলম্বিত লয়যুক্ত শৃঙ্গার রসাত্মক গীত হল পদম্। মধুর ভক্তি এবং নায়ক-নায়িকা ভাব পদম্-এর মূল বিষয়বস্তু। এই জাতীয় গানে পল্লবী, অনুপল্লবী এবং চরণম্ থাকে। স্থূল দৃষ্টিতে পদম্ লঘু ও শৃঙ্গারসাত্মক গীত হলেও এই গীতের একটি স্বকীয় দর্শন আছে। এতে পথপ্রদর্শক বা সদ্ গুরুরুপী সখীর সাহায্যে জীবাত্মা-স্বরূপ নায়ক বা পরমাত্মা-রুপী নায়িকার মিলন ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীতে পদম্ ছিল ভক্তিরসাশ্রিত সরল গীত। পরবর্তীকালে এই গীত প্রেম সঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়। পূর্বে পদম্ একপ্রকার নাট্যগীত এবং শুধুমাত্র ভরত-নাট্যম্ নৃত্যে প্রযুক্ত হত, বর্তমানে কর্ণাটকী সঙ্গীত কার্যক্রমেও পদম্ গাওয়া হয়। প্রখ্যাত পদম্ রচয়িতাগণ হলেন- ক্ষেত্রায়া, কৃষ্ণ আয়ার, অরুণাচল কবি, কুঞ্জর ভারতী, মত্তুভান্ডবর প্রমুখ।

রাগমালিকা:- মধ্যযুগের সঙ্গীতে রাগমালিকা পরিচিত ছিল 'রাগ কদম্বকম'[৪] নামে। রাগমালিকা অনেকগুলি অংশে বিভক্ত এক দীর্ঘাকৃতির সঙ্গীত- যার বিভিন্ন অংশগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাগে গাওয়া হয়। এটি অনেকটা হিন্দুস্তানী রাগমালার মত। রাগমালিকার প্রত্যেকটি অংশ শেষ করা হয় সেই অংশের প্রারম্ভের শব্দ এবং সেই অংশে ব্যবহৃত রাগের চিত্ত স্বর দিয়ে। এরপরে পরবর্তী অংশের ভূমিকা রচিত হয়। তারপরে পরবর্তী অংশ গাওয়া হয়। রাগমালিকা অলঙ্কার সমৃদ্ধ গান এবং এর মধ্যে উচ্চ কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় । মুথুস্বামী দীক্ষিতর, স্বাতী তিরুনল প্রমুখ সঙ্গীত গুণীগণ বহু রাগমালিকা রচনা করেছেন।

বর্ণম্:- পন্ডিতগণ মনে করেন- প্রাচীন 'বর্ণ' নামক প্রবন্ধ বিবর্তিত হয়ে আধুনিক কর্ণাটকী বর্ণম্ গীতবন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। বর্ণমে থাকে- পল্লবী, অনুপল্লবী ও চরনম্। এই গান শৃঙ্গাররসাত্মক। বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত- তিন লয়েই আলাপ ও বিস্তার করা যায়। রাগ ও রাগের ভাবকে বিস্তৃতভাবে পরিস্ফুট করার জন্য যথাযথ ও উপযুক্ত স্বর-সঞ্চালনের মাধ্যমে বর্ণম্ পরিবেশিত হয়। অধিকাংশ সময় কর্ণাটকী সঙ্গীত সভা বর্ণম্ দ্বারা শুরু হয় এবং নৃত্যানুষ্ঠানেও পরিবেশিত হয়ে থাকে। বর্ণম্ চার প্রকার- চৌক বর্ণম, পদ বর্ণম্ ,তান বর্ণম্ এবং ধরু বর্ণম্।

প্রবন্ধম্:- স্বর-সাহিত্য এবং সাহিত্যের সঙ্গে সংমিশ্রিতভাবে 'চোল্লুক্কেট্টু' বা 'সোলুকট্টু' যুক্ত অভ্যাস গানকে প্রবন্ধম্ বলে। এটি হিন্দুস্তানি ত্রিবটের মতো। ত্রিবটে যেমন কাব্য, তারানা ও পাখোয়াজের বোল থাকে এতে তেমনি সাহিত্য ও চোল্লুক্কেট্টু ব্যবহৃত হয়। প্রবন্ধম্ হল অভ্যাস-সঙ্গীতের অপর প্রকার। এটি স্বর-সাহিত্যের চোল্লুক্কেট্টুর সংমিশ্রণে গঠিত। 'চোল্লুক্কেট্টু' হল কর্ণাটকী কণ্ঠ সঙ্গীতে ব্যবহৃত কতকগুলি অর্থহীন শব্দ যা গানের পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন, মৃদঙ্গের কিছু বোল বা পাটাক্ষর- 'তকিতকি', 'তকিধিকি', 'ধিকিতকি' প্রভৃতি। ''তিল্লানা' বা তারানা শৈলীর অর্থহীন শব্দ- দ্রিম্ , তুম্, তারে, দানি ইত্যাদি শব্দগুলিকে চোল্লুক্কেট্টুর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হলেও, 'চোল্লুক্কেট্টুর জন্ম হয় 'যতি' (জতি) নামক একটি প্রাচীন বাদ্য-প্রবন্ধ থেকে'[৫]। প্রবন্ধম্- এর চারটি প্রকারভেদ রয়েছে - সাধারণ প্রবন্ধম্, গ্রহস্বর প্রবন্ধম্, শ্রীরঙ্গ প্রবন্ধম্ এবং কৈবাড় প্রবন্ধম্।

জাবলী:- জাবলী সৃষ্টি হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এটা একপ্রকার লঘু বা হালকা ধরনের গান। সুর বা সাহিত্যে- কোন দিক থেকেই এই গান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত নয়। তেলেগু বা কানাড়া ভাষায় রচিত এই গান। মানবিক দেহজ প্রেম ও চটুল মনোরঞ্জক সুর- এর প্রধান উপজীব্য বিষয়। স্বর রচনায় মাধুর্য সৃষ্টির জন্য এতে রাগের শুদ্ধতা সর্বদা রক্ষিত হয় না। রাগ-রাগনীর বিশুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা এই গানে নেই। শ্রুতি-মধুর রাগ ও তাল সহযোগে জাবলী গাওয়া হয়। রঞ্জকত্বই এই গানের প্রধান উপজীব্য বিষয়। স্বাতি তিরুনল, রামনাথপুরম্, শ্রীনিবাস ইয়ঙ্গর, পট্টনম্ সুব্রহ্মণ্য আইয়র প্রমুখ হলেন উল্লেখযোগ্য জাবলী রচয়িতা।

তিল্লানা:- অষ্টাদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট তিল্লানা হল- সাহিত্য ও অর্থহীন শব্দ বা বাদ্যের বোলযুক্ত গীতবন্ধ। এই গান সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রাণবন্ত ও দ্রুত লয়ে গীত। হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের তারানা, কর্ণাটকী পদ্ধতিতে তিল্লানা নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দুস্তানী 'তারানা' গীতের অনুকরণে নৃত্যের উপযোগী তিল্লানার সৃষ্টি হয়। তারানার মতই নিরর্থক শব্দযুক্ত বাক্যবিন্যাস- এর মূল বিষয়বস্তু। প্রাচীন যুগের অন্যতম তিল্লানা রচয়িতা বীর ভদ্রায়। এছাড়াও স্বাতি তিরুনল, রামনাথপুরম্, শ্রীনিবাস ইয়ঙ্গর প্রমুখ গুণীজন বহু তিল্লানা রচনা করেছেন।

---

[৪] গোস্বামী, প্রভাতকুমার। *ভারতীয় সঙ্গীতের কথা*। আদি নাথ ব্রাদার্স, জানুয়ারী ২০১৬, কলকাতা। পৃষ্ঠা - ৯৪

[৫] নস্কর, ড: স্বপন। *ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিকথা (প্রথম খণ্ড)*, আদি নাথ ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০০৯, কলকাতা। পৃষ্ঠা - ১৩৭

স্বরজাতি:- অষ্টাদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট নৃত্যানুষ্ঠানের উপযোগী সঙ্গীত হল স্বরজাতি। এই শ্রেনির গানের প্রথম অংশে জাতির একটি অনুচ্ছেদ থাকায় এই গান নাচের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীকালে শ্যাম শাস্ত্রী ওই জাতির অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে পুরোপুরি গানে রূপান্তরিত করেন। এই স্বরজাতি রচনায় শ্যাম শাস্ত্রীর কৃতিত্ব অপরিসীম। স্বরজাতির চরণ গুলি দৈর্ঘ্যের দিক থেকে নানা আকারের এবং সেগুলি বিভিন্ন ধাতুতে সন্নিবেশিত। শ্যাম শাস্ত্রী, ত্রিবাঙ্কুরের রাজা স্বাতী তিরুনল, চিন্নকৃষ্ণদাস প্রমুখ কর্ণাটক সঙ্গীত গুণীগণ স্বরজাতির রচয়িতা হিসেবে খ্যাত।

জাতিস্বরম্:- ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই গানের সৃষ্টি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে যেমন সরগম গীতি গাইবার রীতি আছে, দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটকী পদ্ধতিতে তেমনি জাতিস্বরম্ গাইবার প্রচলন দেখা যায়। জাতিস্বরমে কেবলমাত্র ধাতু বা সরগম করা হয়, এতে মাতু বা কাব্যাংশ থাকে না। ভরতনাট্যম্ নৃত্যে প্রযুক্ত হয় এমন একটি অভ্যাস গান এটি। এই গান মূলত: নৃত্যেরই গান। জাতিস্বরম্ রাগ ও তালে গীত হয়, এর তিনটি তুক্ হল- পল্লবী, অনুপল্লবী ও চরনম্।

গীতম্:- স্বরাবলী ও অলঙ্কার অনুশীলন করার পর শিক্ষার্থীকে গীতম্ অভ্যাস করতে হয়। সুতরাং গীতম্ও অভ্যাস সঙ্গীতের একটি প্রকার। গীতম্- এর কাব্যাংশ সাধারণত সংস্কৃত ও কানাড়ী ভাষায় রচিত। এতে- ইয়, ঈয়, তীয়, ত্রয় অম্, রের ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই শব্দগুলিকে 'মাতৃকা পদ'[৬] বলে। রাগরূপের সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করার জন্যই এই সঙ্গীতে কাব্যাংশ রচিত হয়। গীতম্ গানের গতি মধ্যলয় যুক্ত এবং সরল তালের প্রয়োগ করা হয়। বিষয়বস্তুর বিচারে গীতম্ দুই প্রকারের - লক্ষ্য গীত ও লক্ষণ গীত।

কল্পনা-সঙ্গীত:- শিল্পীর কল্পনা, চিন্তা, জ্ঞান ইত্যাদি নিবদ্ধ সঙ্গীতে যুক্ত হলে তা কল্পনা সঙ্গীতে পরিণত হয়। কল্পনা-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত কিছু গীতের সংক্ষেপে বর্ণনা :

কল্পনা-স্বরম্:- কল্পনা-স্বরম্ হল শিল্পীর নিজস্ব স্বর-রচনা। এতে শিল্পীর কল্পনা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়। কল্পনা-স্বরম্ – 'কল্পনা সঙ্গীত'- এর প্রধান অঙ্গ।

আলাপনম্ বা রাগম্:- শাস্ত্রীয় রীতি অনুযায়ী কোন রাগের স্বরগুলিকে বিস্তার করাকে আলাপনম্ বা রাগম্ বলে। রাগরূপ স্পষ্টিকরণ করাই আলাপনম্ এর মুখ্য উদ্দেশ্য। আলাপনম্- এ কোন সাহিত্য থাকে না। আলাপনম্ -এর তিনটি স্তর (ক) আক্ষিপ্তিকা বা আয়িত্তম্, (খ) রাগবর্ধনী বা করনম্ (ই) তানম্

তানম্:- অ-কার এবং তা, ন, ম্ প্রভৃতি অক্ষর দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাগের বিস্তার করাকে তানম্ বলে। তানম্ দ্বারা রাগের রূপ পূর্ণভাবে বিকশিত হয়, প্রাচীন আলাপ এবং আলপ্তির অনুসরণে তানম্ সৃষ্টি হয়েছে। শাস্ত্রসম্মত পূর্ণ স্বরজ্ঞান ছাড়া তানম্ গাওয়া যায় না। তানম্ এর দুটি পর্ব আছে - স্থায়ী এবং মকররিণী বা বর্তণী।

পল্লবী:- আলাপনম্ ও তানম্-এর পর পল্লবী গাওয়া হয়। চার বা পাঁচটি শব্দ দ্বারা রচিত সাহিত্যকে রাগ ও তালে নিবদ্ধ করে বিলম্বিত লয়ের জটিল গতি প্রদর্শন করে এই গান গাওয়া হয়। ত্যাগরাজ রচিত পল্লবী গুলি খুবই চিত্তাকর্ষক।

স্বরাবলী:- হিন্দুস্তানী সঙ্গীতে যেমন অলঙ্কার বা পাল্টা অনুশীলন করা হয় তেমনি কর্ণাটকী সঙ্গীতে স্বরাবলী অভ্যাস করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন মেলে বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত- এই তিন লয়ে স্বরাবলী গাওয়া হয়।

নিরবল:- 'নিরবল' শব্দের অর্থ ভরাট করা। নিরবল গায়ন কোন স্বতন্ত্র গীত পদ্ধতি নয়, কৌশল মাত্র। কীর্তনম্ জাতীয় কৃতির তুক্গুলির সাহিত্য নিয়ে দুই থেকে চার আবর্তনে কল্পনা-স্বর সহযোগে সঙ্গীত পরিবেশনের নামই নিরবল। এটি স্বরবিস্তারের সময় 'অ', 'ই' ইত্যাদি অক্ষর গুলির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো বা

৬. নস্কর, ড: স্বপন। *ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিকথা (প্রথম খণ্ড)*, আদি নাথ ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০০৯, কলকাতা। পৃষ্ঠা - ১৩৮

গানের সাহিত্য যতগুলি মাত্রার মধ্যে বাঁধা রয়েছে, তার মধ্যেই হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করার পদ্ধতি।

রাগ-মালিকা বৃত্তম্:- রাগ-মালিকা বৃত্তম্ -এর গায়ন ভঙ্গি হুবহু নিবদ্ধ সঙ্গীতের অন্তর্গত রাগ-মালিকার মত। পার্থক্য কেবল এই- এতে কল্পনা স্বর ব্যবহৃত হয় এবং রাগ ও তাল ব্যবহারের কোন নির্দিষ্ট রীতি নেই। এতে রাগ ও তাল অপেক্ষা সাহিত্যের অর্থ ও ভাবকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

দক্ষিণ ভারতের কেরলে অভিজাত রাগ সঙ্গীতের পাশাপাশি লোকসঙ্গীতেরও যথেষ্ট সমাদর আছে। কেরলের সঙ্গীত- 'সোপান' ও 'দেশীয়' এই দুই নামে পরিচিত। এই দুটি নাম আসলে দুটি গায়কী ধারার পরিবর্তে ব্যবহৃত। 'সোপান' হল অভিজাত ক্লাসিক্যাল শ্রেণির গান এবং এটি কেরলের প্রাচীন সঙ্গীত। মন্দিরের গর্ভ গৃহে যাওয়ার জন্য সোপানের (সিঁড়ি) উপর থেকেই এই শ্রেণির গান গাওয়া হয়। সোপান সঙ্গীতে সাহিত্য বা কথার প্রভাব থাকে বেশি এবং রাগের প্রভাব অনেকটা গৌণ। মোটকথা কেরল তথা দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্রই অভিজাত রাগ সঙ্গীতের পাশাপাশি দেশি সঙ্গীতেরও (Folk song) সমাদর দেখা যায়। উত্তর ভারতের ক্ষেত্রেও তাই।

উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বাহ্যিক প্রভাব দ্বারা বিকশিত কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত স্বতন্ত্র শৈলির এবং তুলনামূলকভাবে প্রাচীন ও পরিশীলিত পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে। ঐতিহ্যবাহী দক্ষিণী সঙ্গীতের ঐশ্বর্য, উদ্ভাবন, বৈচিত্র অনেকাংশেই মৌলিকতার দাবি রাখে। তবে এখনো উভয় পদ্ধতির মধ্যে যেমন কিছু বৈষম্য আছে, তেমনি সাম্যও আছে কয়েকটি ক্ষেত্রে। বর্তমানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিল্পীরা, কর্ণাটকী রাগগুলির প্রতি আকৃষ্ট। উভয়েই উভয় পদ্ধতির রাগগুলিকে অনুশীলন করতে বর্তমানে যত্নশীল। আশাবাদী যে- এই পারস্পরিক সহানুভূতি ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ক্রমে উভয় পদ্ধতির শিল্পীদের মধ্যে মৈত্রী ও সংহতির ভাব জাগ্রত হবে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। রাগ ও রূপ (দ্বিতীয় ভাগ)। শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, জুলাই ১৯৯৯, কলিকাতা।
২) প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। রাগ ও রূপ (প্রথম ভাগ), শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, জুলাই ১৯৯৬, কলিকাতা।
৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলরতন। সংগীত পরিচিতি (পূর্ব-ভাগ)। আদি নাথ ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০০৩, কলকাতা।
৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলরতন। সংগীত পরিচিতি (উত্তর-ভাগ)। আদি নাথ ব্রাদার্স, জানুয়ারী ২০০৭, কলকাতা।
৫) নস্কর, ড. স্বপন। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিকথা (প্রথম খণ্ড)। আদি নাথ ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০০৯, কলকাতা।
৬) গোস্বামী, প্রভাতকুমার। ভারতীয় সঙ্গীতের কথা। আদি নাথ ব্রাদার্স, জানুয়ারি ২০১৬, কলকাতা।
৭) দত্ত, দেবব্রত। সঙ্গীত তত্ত্ব। ব্রতী প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১৫, কলকাতা।